আর্টিস্ট

(গল্পগ্রন্থ – কুশল পাহাড়ি)

হঠাৎ অশ্বিনীকে দেখে শ্যামাচাঁদগঞ্জের বাজারে আমি বড়ইআশ্চর্য হয়ে গেলাম। আমাদের গ্রামের লোক অশ্বিনী। তবেআজ বহুকাল ও দেশছাড়া। অশ্বিনী আমাদেরই বয়সী হবে। ওরবাবা অভয় দাস ভিক্ষে করে সংসার চালাতো। আমাদের গ্রামেতাকে বলতে 'অবাই দাস'। অবাই দাস খঞ্জনী বাজিয়ে হরিনামকরে পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষা করতো এ আমি নিজে দেখেচি।তারপর অবাই দাস কতকগুলি অপোগণ্ড ছেলেমেয়ে রেখেমারা গেল। ওর বিধবা স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে কোথায় যেন চলে গিয়েছিল তা কেউ খোঁজ রাখে না। ওদের বাড়িঘর গ্রামের হরিনাথ চৌধুরী মহাশয় নিজের জমির অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েসেখানে তরিতরকারির বাগান করেছিলেন। অবাই দাসের স্ত্রীযখন এ গ্রাম ছেড়ে চলে যায়, তখন অশ্বিনীর বয়স হবে আট বছর। আমার সঙ্গে ওর বড় ভাব ছিল। অশ্বিনী সকালে এসেআমাদের বাড়ির ডোবাতে কঞ্চির ছিপ ফেলে বসতো বর্ষারদিনে। আমরা জিগ্যেস করলে বলতো উল্কো মাছ ধরচে। কিন্তুসবাই জানি, ও ডোবাটায় মাছের চিহ্নও নেই আর অশ্বিনীর ছিপেও না আছে সত্যিকারের সুতো, না আছে সত্যিকার বাঁড়শি।

তারপর ষোল-সতেরো বছর চলে গিয়েচে। অশ্বিনীকেভুলে গিয়েছিলাম। ইতিমধ্যে আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন।আমরা দু'ভাই পয়সা ওড়াতে লাগলাম, জমিজমা বিক্রি করে ফুর্তি করতে লাগলাম। সেও আজ সাত বছর আগেকার কথা হবে—যে সময়ের কথা বলচি তখন বাবার তিনটি গোলাশূন্য করে ফেলেচি, অর্ধেক ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি মৌরুসি দিয়েচিবা বিক্রি করেচি, মায়ের গহনাগাঁটি প্রায় সব বন্ধক পড়েচে। সুতরাং আমাদের ফুর্তির সমুদ্রে কিছু ভাঁটা পড়ে এসেচে।

শ্যামাচাঁদগঞ্জে গিয়েছিলাম ফুর্তির সন্ধানে। খুব জাঁকেরবারোয়ারি হয় শ্যামাচাঁদগঞ্জে। অনেক রকম ফুর্তির সন্ধানএখানে পাওয়া যাবে শুধু এই আশাতেই গিয়েছিলাম সেখানে।আমি একাই গিয়েছিলাম, দাদা আসেনি। কলাই বুনবার জন্যবাড়িতেই আছে।

হঠাৎ অশ্বিনীকে এতদিন পরে দেখে ভারি অবাক হয়েগেলাম। অশ্বিনী আমাকে বললে—চিনতে পারেন বাবু ?

—হুঁ। তুই তো অশ্বিনী, অবাই দাসের ছেলে !

—ঠিক চিনেচেন। এখানে কি মনে করে ?

—যাত্রা শুনতে।

—যাত্রা শুনবেন ?কিসে এলেন ?

—তুই আপনি-আজ্ঞে করে কথা বলচিস কেন অশ্বিনী ?ভুলে গেলি নাকি আমাকে ?

—না বাবু, এতকাল পরে দেখা। এখন আপনারা বড়হয়ে গিয়েচেন, এখন কি আর ছেলেবেলার মতো কথাবার্তা আপনার সঙ্গে শোভা পায় ?এখন আর সেটা ভালো দেখায় না।কি করছেন আজকাল ?

—বাড়িতেই থাকি।

—তা আপনাদের ভাবনা কি ?জমিদার মানুষ। কাকাবেঁচে আছেন ?

—না। বাবা আজ আট-ন'বছর মারাগিয়েচেন।

আমাকে দাঁড় করিয়ে অশ্বিনী কোথায় চলে গেল। অল্পক্ষণ পরে এসে বললে—চলে আসুন আমার সঙ্গে।

—ও কি ?মদ ?

—ভালো জিনিস, আসুন।

আমি বিস্ময়ের সুরে বললাম—হারে, সে কি ! তুই অবাই দাস বোষ্টমের ছেলে, তোর বাবা হরিনাম না করে জল খেত না—তুই মদ খাস ?আমাদের কথা বাদ দে, আমরা তো উচ্ছন্নে গিয়েচি—

অশ্বিনী হেসে বললে—চলুন বাবু।

—এখন ও সব খাব না। আসরে ভিড় হয়ে গেলে জায়গাপাব না বসবার। এখানে আমাকে চেনে কে ?কেউ খাতিরকরবে না।

—বসবার জন্যে কোনো ভাবনা নেই বাবু। সে ভারআমার উপর রইল !

—না, তুমি আমাকে মাপ করো। আমি এই বিদেশবিভুঁয়েএসে মদটা খাবো না। মা বাড়ি থেকে বেরোবার সময় বারণকরে দিয়েচে—মাইরি বলচি !

—আচ্ছা তবে খাবারের দোকানে আসুন। খানকতকসিঙ্গাড়া খাবেন চলুন—

খাবার-দোকানে বেশ খানিকটা দেরি হয়ে গেল। এদিকেআমি খেতে খেতেই দেখচি আসর লোকে ভর্তি হয়ে গেল। সেখানে আমার মতো বিদেশী লোককে কেউ বসতে জায়গা দেবে না। অশ্বিনী বড় গোলমাল বাধালে দেখচি। অশ্বিনীকে কথাটা বলতে সে হেসে বললে—কেন ভাবছেন বাবু ?আমিযখন আছি, তখন আপনি নির্ভাবনায় থাকুন। খুব ভালো জায়গায় আপনাকে না বসিয়ে দিতে পারি তবে আমি অবাইদাস বৈরাগীর ছেলে নই।

অশ্বিনীর এ আশ্বাস-বাণীতে আমার কিন্তু ভরসার উদ্রেক হল না বিন্দুমাত্রও। ও নেশার ঝোঁকে দায়িত্বহীন আবোল-তাবোল বকচে। ওকে কে পুছবে এত বড় আসরেরমধ্যে ?আজ এত কষ্ট করে এত দূরে যাত্রা শুনতে আসা দেখচিনিরর্থক হয়ে গেল। কি হাঙ্গামা বাধালে অশ্বিনী !

অশ্বিনী আমার হাতে দুটো পান এনে দিয়ে বললে—খান, আমি জামাটা গায় দিয়ে আসি।

—আরো দেরি করবে অশ্বিনী ?আমার আজ আর যাত্রাদেখা হল না।

—না হয় তো জুতো খাব আপনার কাছে।

সে চলে গেল। আমি নিরুপায় হয়ে সেই পানের দোকানের সামনে বসেই রইলাম, কারণ তখন আমার একার কর্ম নয়—এতবড় আসরে ভিড় ঠেলে ঢুকে জায়গা করে নেওয়া। যখন ও আবার ফিরে এল তখন আসরে কনসার্ট বাজনা শুরু হয়ে গিয়েছে। দেখি ও বেশ সেজেগুজে এসেচে।গায়ে একটা মটকার পাঞ্জাবি, মাথায় একখানা চাদর পাগড়ির মতো করে বাঁধা, দিব্যি ফর্সা ধুতি পরনে। ও কি বিষয়-কর্ম করেতাও জানিনে, একবার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল।

ওর পেছনে পেছনে আসরে ঢুকলাম। যেখানে যাত্রারদল বসে কনসার্ট বাজাচ্চে সেই ফটকে জনকয়েক ভলান্টিয়ারদাঁড়িয়ে ফটক পাহারা দিচ্ছে। অশ্বিনী গিয়ে সেই ফটকেদাঁড়ালো। ভলান্টিয়াররা ভাবলো, আমরা যাত্রাদলের লোক। পথ ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ালো এক পাশে। তার একটু আগে প্রথমদফা কনসার্ট বাজনা থেমেছে সবে।

এমন সময়ে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটলো।

দলের পাখোয়াজ-বাজিয়ে হঠাৎ ফটকের দিকে চেয়েঅশ্বিনীকে দেখতে পেয়ে সচকিতভাবে পাশের ফুলুট-বাজিয়েকে বললে—অশ্বিনীবাবু—

—কে ?

—ঐ যে অশ্বিনীবাবু।

অমনি ফুলুট-বাজিয়ে বাঁশিটা নামিয়ে রেখে আস্তে আস্তে অশ্বিনীর কাছে এসে হাতজোড় করে বললে—আসুনআসুন অশ্বিনীবাবু, আসুন ! আপনি এখানে ?

অশ্বিনীর দিকে চেয়ে দেখি ওর গলার সুর ও মুখের ভাব বদলে গেচে। আমার সঙ্গে খানিক আগে যে সুরে কথা বলছিলসে-সুর আর গলায় নেই, সে মানুষই আর ও নয়। গম্ভীর সুরেবললে—একটু কাজে এসেছিলাম এখানে—আপনি বোধ হয়দলের ম্যানেজার ?

“আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের সৌভাগ্য যে আপনার মতো লোক আজ এখানে।

আমি মনে মনে ভাবচি, ব্যাপার কি ?অশ্বিনী কি কাজ করে ?এত বড় দলের ম্যানেজার স্বয়ং এসে ওকে অভ্যর্থনা করচেনবাব খান্‌জা হয়ে গেল নাকি অশ্বিনী, অবাই দাসবোষ্টমের ছেলে ?

অশ্বিনী আমার হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে এসে বললে—ইনি আমার বিশিষ্ট বন্ধু, ব্রাহ্মণের ছেলে, এঁকে একটু ভালো জায়গায় বসিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করতে হবে—ইনি বসবার জায়গা পাচ্ছেন না।

আমি লক্ষ্য করছি, যাত্রাদলের বাজিয়েরা সকলে এ ওকে আঙুল দিয়ে অশ্বিনীকে দেখাচ্ছে আর সকলেই কৌতূহলের দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে। যেন কি দুর্লভ বস্তুর দর্শনলাভ আজ ঘটেচে ওদের ভাগ্যে, ভাবখানা এইরকম। আমি নিজেও আশ্চর্য হয়েছি মনে মনে। কেন অশ্বিনীকে এতক্ষণ জিজ্ঞাসা করি নি যে ও কি করে ?না, সে আর জিগ্যেস করাই হবে না।ও-ই বা কি মনে করবে ! আমাকে তো ওরা পরমযত্নে হাত ধরেনিয়ে গিয়ে বসালে, সেই সঙ্গে অশ্বিনীকেও।

দলের কে একজন আমার হাতে একটা সিগারেট দিয়েবললে, খান।

অশ্বিনীকেও দিতে গেল, অশ্বিনী আমাকে ইঙ্গিতেদেখিয়ে বললে-বাপ্‌রে, ওঁর সামনে খাইনে। আমাদের গ্রামের জমিদারের ছেলে।

এইসময় ম্যানেজার হাতজোড় করে অশ্বিনীকেবললে— এইবার আপনি একটু বাজান দয়া করে। আপনি এখানে বসেথাকতে কেউ পাখোয়াজে হাত দিতে সাহস করচে না।

-না না, তাতে কি। হোক, আমি শুনি। বেশ বাজানউনি।

মুরুব্বিয়ানা চালে এটা বললে অশ্বিনী।

—আজ্ঞে না, আপনি আসরে বসে থাকতে কারো সাহসহচ্ছে না বাজাতে। একখানা বাজিয়ে দিন আপনি।

পাখোয়াজ-বাজিয়েও একবার এসে হাতজোড় করেবললে—আপনি আমাদের গুরুস্থানীয়, মাথার মণি। আজ্ঞে আপনি এখানে থাকতে বাবু আমাদের কি যন্তরে হাত দেওয়াসাজে ?

অশ্বিনী মৃদু হেসে (তাও মুরুব্বিয়ানা চালে, আগেকার সেঅশ্বিনী যেন আর নেই) পাখোয়াজ ধরেএগিয়ে নিয়ে বসলো।কানে কানে কথা ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে, সাজঘর থেকেপর্যন্ত যাত্রা দলের লোক এসে ফটকের কাছে জড়ো হয়েকৌতূহলে অশ্বিনীর বাজানো দেখতে ভিড় করলে। বাজনাওবটে অশ্বিনীর। বাপের বিষয় উড়িয়ে ফুর্তি করবার সময়ে গানবাজনার দিকেও একটু-আধটু মন দিয়েছিলাম, খুব বেশি নাবুঝলেও গানবাজনা সম্বন্ধে নিতান্ত অর্বাচীন নই। পাখোয়াজ ধরে অশ্বিনী যখন ঘা দিতে লাগলো, তখন যেন মনে হল, গুরুগুরু শব্দে মেঘ গর্জন হচ্চে কোথাও আকাশে। মেঘে মেঘে তার ধ্বনি, ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি। আসর এক মুহূর্তে জমেগেল। স্তব্ধ হয়ে গেল লোকজনের কোলাহল। সবাই উৎসুক নয়নে চেয়ে দেখছে, সবারই কানে গিয়েচে—এই যে লোকটি পাখোয়াজ বাজাচ্চে, উনিই অশ্বিনীবাবু স্বয়ং। লোকের দৃষ্টিতেকি ঔৎসুক্য, কি আনন্দ, মুখেকি সম্ভ্রম আর শ্রদ্ধা ! আমি শিল্পীনই, কিন্তু ওস্তাদ শিল্পীর প্রতি এই মৌন শ্রদ্ধা আমার অন্তর স্পর্শ করলে। আমি নিজেও গর্ব অনুভব করলাম যে, অশ্বিনীআমার বাল্যবন্ধু। এতক্ষণ একে ভিখিরি অবাই দাস বোষ্টমের ছেলে বলে মনে মনে যে অবজ্ঞার ভাব পোষণ করেছিলুম, তারস্থান অধিকার করলে ওর প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধা ও বিস্ময়।এই বিস্ময়টা যেন আমি কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না। এইসেই অশ্বিনী, অবাই দাসের ছেলে, দোচালা ঘরে বাস করতো, ভিক্ষে করে সংসার চালাতো ওর বাপ-মা।

অশ্বিনীর বাজনা থামলে পাখোয়াজ-বাজিয়ে ওর পায়েরধুলো নিয়ে বললে—আশীর্বাদ করুন যেন আপনার মতো হাত হয়। ম্যানেজার গদ্‌গদ কণ্ঠে বললে—সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখতে হয় হাত আপনার। দয়া করে একবার ডুগিতবলাটা—

অশ্বিনীকে এতক্ষণ দু'দিক থেকে দু'জনে পাখার বাতাস করচে। আসরে বড় গরম। পাখোয়াজ-বাজনার শ্রমে অশ্বিনী ঘেমে উঠেচে। গ্রামের জমিদারের ছেলে আমি, ওর পাশে বসেনিজেকে নিতান্ত নগণ্য মনে করতে লাগলুম। পালা আরম্ভ হয়ে গেল। অশ্বিনী ওদের অনুরোধে বার কয়েক পাখোয়াজ আর ডুগি-তবলা বাজালে। ওস্তাদের হাত দেখলুম বটে ওরসমস্ত বাজনার মধ্যে।

তৃতীয় অঙ্কের শেষে দুজনে বার হয়ে এলুম ফাঁকায়।

অশ্বিনী বললে—বাবু, এবার একটু চলবে ?

—না ভাই। আমায় অনুরোধ কোরো না।

—কি খাবেন ?

—কিছু খাবো না। চল, একটু চা খাই।

—উঁহু, ওতে আমার মৌতাত থাকবে না। আপনি খান। আসরে ওরা বাজাতে বলবে। সাদা চোখে হাত খোলে না—

আমি কৌতূহলের সুরে বললাম—অশ্বিনী, আজ বড় আনন্দ পেলাম। কতদিন তোরা গ্রাম ছেড়েছিস, তোদের কোনো সংবাদও পাইনি—তুই যে এত বড় হয়ে উঠেছিস তা আজ তোকে দেখে—

অশ্বিনী আমার পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিলে।বললে— চলুন কিছু খেতে হবে।

—তা হবে না। আমি তোমাকে আজ খাওয়াব।

—তা কি হয় ! আপনাদের খেয়ে তো আমরা মানুষ।আজ আমি খাওয়াব আপনাকে। আমি যেদিন আপনাদের বাড়িযাবো, সেদিন খাওয়াবেন আপনি।

অশ্বিনীকে জোর করে খাওয়ালুম একটা খাবারের দোকানে সিঙ্গাড়া আর সন্দেশ। ও ছাড়লে না আমাকে খাওয়াতে।

বাল্য কালের কথা, আমাদের গ্রামের কথাও অনেক বলতে লাগলো। ওর মা বেঁচে নেই। ছোট ভাইকে কোথাকার দোকানে কাজে ভর্তি করে দিয়েচে। কালনার কাছে গোপীনাথপুরে অশ্বিনী বিবাহ করেচে। শ্বশুরের কাপড়ের দোকান কালনা বাজারে। একমাত্র মেয়ে, শ্বশুর চোখ বুজলে ওর স্ত্রীই সম্পত্তি পাবে।

বললাম—বাজনা শিখলে কোথায় ?

ও হেসে বললে-ঝোঁক ছিল ওদিকে। ওস্তাদের দয়ায়আর আপনাদের আশীর্বাদে—বাবা ছিলেন গাইয়ে-বাজিয়ে, তাঁর সেই গুণটা অর্শেচে আমাতে। ওস্তাদ পেয়েছিলাম যাত্রার দলের বড় বাজিয়ে দুর্লভরাম সাধুখাঁকে। তিনি আমাকেহাত ধরে শেখান। যজ্ঞেশ্বর নন্দীর কাছে তবলা শিক্ষা করি।আজ্ঞে, তা আপনার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে এমন সব ওস্তাদ পেয়েছিলাম, যাদের এক ডাকে লোকে চেনে। পয়সাও রোজগার করি। কেন মিথ্যে বলবো, যেদিন যে আসরে ঠিকেবাজাবো, তিন টাকা রাত; আর খোরাকী—দুধ আর ইয়ে—ওই যা বললাম—মৌতাত। তা বায়না লেগেই আছে দাদাবাবু। মাসেএকশ টাকা কেউ মারে না, রাজার হালে খাওয়া-দাওয়া—আরসে আর আপনাদের সামনে কি বলবো—খাতিরও কিছু করেলোকে।

ওই ঘটনার পরে অনেক দিন হয়ে গিয়েচে। প্রায় পনেরোষোলো বছর হবে।

অশ্বিনীর সঙ্গে আমার আর কখনো দেখা হয়নি।

গত বৈশাখ মাসে একদিন বাইরের ঘরে বসে আছি, একটি গরিব স্ত্রীলোক একটি ছোট মেয়ের হাত ধরে আমাদের বাড়ির নীচে ভিক্ষে করতে ঢুকলো। আমার অবস্থাও যথেষ্ট খারাপ হয়ে গিয়েচে, যৌবনের সে উদ্দাম স্রোত আমাকে এইশুষ্ক বালুচরে বসিয়ে কোনদিক দিয়ে যে নিঃশব্দে অন্তর্হিত হয়েচে তার সন্ধানও পাই নি।

বেশ একটু পরে স্ত্রীলোকটি আধখানা কুমড়ো আর কিছুচাল আঁচলে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

আমার বড় মেয়েকে জিগ্যেস করলাম ডেকে—ও কে ?ওকে তো কখনো দেখিনি !

বড় মেয়ে যা বললে তার মোট মর্ম এই, ওরা ওপাড়ার গৌড়দাস বৈরাগীর বাড়ি এসেচে। এই গ্রামেই আগে ওর শ্বশুরের বাড়ি ছিল। ওর স্বামীর নাম ছিল অশ্বিনী। যাত্রাদলে বাজনা বাজাতো। ওর স্বামী মারা গিয়েচে, আজ চার-পাঁচবছর। কিছু রেখে যায়নি, নেশাভাঙ করে সব উড়িয়ে দিয়ে গিয়েচে। কেউ কোথাও নেই ওদের। গৌরদাস ওই বৌটারকি রকমের ভাশুর, তাই ওদের আশ্রয়ে এসে উঠেচে। গৌরদাসেরও তো অবস্থা খারাপ, কাজেই ওকে ভিক্ষে করে চালাতে হয়—নইলে উপায় কি।

উপায় যে কিছু নেই, তা নিজেকে দেখেই আজকাল বেশ বুঝতে পারি।

সে কথা অবিশ্যি আর বড় মেয়েকে বললুম না।